শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সংরক্ষণযোগ্য পাক্ষিক পত্রিকা

জেলার খবর সমীক্ষা

বর্ষ - ৭, ৮ম সংখ্যা, ১৬ কার্তিক ১৪২০ (৩ নভেম্বর ২০১৩) মূল্য - ২ টাকা D.L. No.-21 Dt. 05.04.07

একমেবাদ্বিতীয়ম

সৈয়দ মুজতবা আলী

সুকুমার রায়ের মতো হাস্যরসিক বাঙলা সাহিত্যে আর নেই সে-কথা রসিকজন মাত্রেই স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু এ-কথা অল্প লোকেই জানেন যে, তাঁর জুড়ি ফরাসি, ইংরেজি, জর্মন সাহিত্যেও নেই, রাশানে আছে বলে শুনিনি। এ-কথাটা আমাকে বিশেষ জোর দিয়ে বলতে হল, কারণ আমি বহু অনুসন্ধান করার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছি।

একমাত্র জর্মন সাহিত্যের ভিলহেল্‌ম্‌ বুশ সুকুমারের সমগোত্রীয় — স্ব-শ্রেণী না হলেও। ঠিক সুকুমারের মতো তিনি অল্প কয়েকটি আঁচড় কেটে খাসা ছবি ওতরাতে পারতেন। তাই তিনিও সুকুমারের মতো আপন লেখার ইলাসট্রেশন নিজেই করেছেন। বুশের লেখা ও ছবি যে ইউরোপে অভূতপূর্ব, সে-কথা 'চরুয়া' ইংরেজ ছাড়া আর সবাই জানে।

বুশ এবং সুকুমার রায়ে প্রধান তফাত এই যে, বুশ বেশির ভাগই ঘটনা-বহুল গল্প ছড়ায় বলে গিয়েছেন এবং সে-কর্ম অপেক্ষাকৃত সরল, কিন্তু সুকুমার রায়ের বহু ছড়া নিছক 'আবোল-তাবোল', তাতে গল্প নেই — আছে শুধু মজা আর হাসি। বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত যে-রকম শুধুমাত্র ধ্বনির উপর নির্ভর করে, তার সঙ্গে কথা জুড়ে দিয়ে গীত বানাতে হয় না, ঠিক তেমনি সুকুমার রায়ের বহু বহু ছড়া স্রেফ হাস্যরস, তাতে অ্যাকশান নেই, গল্প নেই অর্থাৎ আর-কোনও দ্বিতীয় বস্তুর সেখানে স্থান নেই, প্রয়োজনও নেই। এ বড় কঠিন কর্ম। এ-কর্ম তিনিই করতে পারেন, যাঁর বিধিদত্ত ক্ষমতা আছে। এ জিনিস অভ্যাসের জিনিস নয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এ-বস্তু হয় না।

একদা প্যারিস শহরে আমি কয়েকজন হাস্যরসিকের কাছে 'বোম্বাগড়ের রাজা'র অনুবাদ করে শোনাই — অবশ্য আমসত্ত্বভাজা কী তা আমাকে বুঝিয়ে বলতে হয়েছিল এবং 'আলতা'র বদলে আমি লিপস্টিক ব্যবহার করেছিলুম।

ফরাসি কাফেতে লোকে হো-হো করে হাসে না, এটিকেটে বারণ, কিন্তু আমার সঙ্গীগণের হাসির হর্‌রাতে আমি পর্যন্ত বিচলিত হয়ে তাঁদের হাসি বন্ধ করতে বারবার অনুরোধ করেছিলুম। কিছুতেই থামেন না। শেষটায় বললুম, 'তোমরা যেভাবে হাসছ, তাতে লোকে ভাববে, আমি বিদেশি গাড়ল, বেফাঁস কিছু একটা বলে ফেলেছি আর তোমরা আমাকে নিয়ে হাসছ — আমার বড় লজ্জা করছে'। তখন তাঁরা দয়া করে থামলেন।

আগে থেকেই জানতুম, কিন্তু সেদিন আবার নতুন করে উপলব্ধি করলুম, যদিও সুকুমার রায় স্বয়ং বলেছেন, 'উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়', যে-জগতে সুকুমার বিচরণ করতেন, সেখানে তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম।

(— লেখকের 'ধূপছায়া' গ্রন্থের 'সুকুমার রায়' রচনার অংশবিশেষ সংকলিত হ'ল। লেখককৃত বানান অপরিবর্তীত রাখা হল)

আমাকে ভাবায় সুকুমার রায়

কবীর সুমন

(এইচ. এম. ভি. থেকে প্রকাশিত কবীর সুমনের 'নিবিদ্ধ ইস্তেহার' অ্যালবাম থেকে সংকলিত)

আমাকে ভাবায় সুকুমার রায়,
আমাকে ভাবায় সুকুমার রায়।
শব্দ ছোটে নিজের ছন্দে,
হাল্কা কল্‌কে ফুলের গন্ধে,
অক্ষর ছোটে, অক্ষর গায়,
আমাকে ভাবায় সুকুমার রায়।
কথার ওপর কথার টেক্কা,
কথায় টানছে কথার এক্কা,
কথায় সওয়ার, কথার ঘোড়া,
কথার ছন্দ পদ্য ছোটায়,
আমাকে ভাবায় সুকুমার রায়।
ছন্দ ফেরে নিজের খোঁজে,
নিজের মর্ম নিজেই বোঝে,
মর্মটা তার তালেই নাচায়,
আমাকে ভাবায় সুকুমার রায়।

আবোল তাবোল

যুবনাশ্ব

মানে না বুঝে ভালোবাসার একটা বয়স আছে। ছেলেবেলাটা সেই বয়েস। শিশু যা দেখে তাই ভালোবাসে। মানে, অর্থ, তত্ত্ব ইত্যাদি কিছু জানবার ইচ্ছেই তার হয় না, খাম্‌কা ভালোবেসেই সে সুখী।

জ্ঞানের আয়তন বাড়বার সাথে সাথে তার খুশির আয়তন কমে আসে। ক্রমে সে দেখে, সব তার পেছনেই হুঁকো মুখ করে মস্ত মানে বসে পরম বিজ্ঞভাবে ঝিমুচ্ছে, — উঁকি দিতে গেলেই বলে, বোসো, বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিই। শিশু মনের এই খাম্‌খা আনন্দের জগৎ আবিষ্কার করবার পর থেকে চেষ্টা চল্‌ছে, কি করে আবার সেখানে ফেরা যায়। বয়সের চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারলে কথা ছিল না, কিন্তু সে সম্ভব নয়।

অর্জিত জ্ঞানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে চট পট্‌ যদি লেপা পোঁছা শিশু-চিত্তে ঢোক্‌বার কোনো রাস্তা থাক্‌ত, মানুষ সেটা বার করে ফেল্‌তে কসুর কর্‌ত না। তবে, ঘা খেয়ে হাল্‌ ছাড়বার পাত্র মানুষ নয়, তাই সে হাল ছাড়ে নি। শিশু হবার অসাধ্য সাধন ছেড়ে, কি করে শিশু-জগতের অর্থহীন আব্‌-হাওয়াটাকে প্রবীণ চিত্তে সংক্রামিত করে নেওয়া যায়, মানুষ তারই চেষ্টা দেখছে। ইংরেজি নন্‌সেন্স এবং বাংলা আবোল তাবোল সাহিত্য এই প্রয়াসেরই অভিব্যক্তি।

আমাদের হুঁকোমুখো হ্যাংলার দেশে আবোল তাবোল সাহিত্য বহুল পরিমানে প্রচলিত হয়নি, এ দুর্ভাগ্যের কথা হতে পারে, কিন্তু সত্যি কথা। স্বর্গীয় সুকুমার রায় কলম ধরে আবোল তাবোল সাহিত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। দেশশুদ্ধ ছেলে বুড়োর প্রাণ খুলে হাসবার খোরাক তিনি একা যত জুগিয়ে গেছেন, অন্য কোন দেশের সাহিত্যে তার তুলনা মেলে না। আমাদের অকাল বৃদ্ধ দেশ — চিন্তাগ্রস্ত, নষ্টস্বাস্থ্য মানুষ দিয়ে ভরা। হাসবার দরকার আমাদের যত বেশি, এমন বোধহয় আর কারো নয়। কম দুঃখে কবি লেখেন্‌ নি —

রাম গরুড়ের বাসা, / ধম্‌ক দিয়ে ঠাসা,
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়, নিষেধ সেথায় হাসা

আবোল তাবোল কবিতায় কথার খেলোয়ারী মার প্যাঁচ অত্যাবশ্যক, তেমনিই গভীর অন্তর্দৃষ্টিও আবশ্যক। যা' তা' লিখলেই আবোল তাবোল হয় না। আবোল তাবোল সাহিত্যিকারের দরদ চাই, রসানুভূতি চাই, শিল্প সৌকর্য্য চাই — এর একটিকে বাদ দিতে গেলেই রচনা পঙ্গু হবে। কবির কল্পনা আজগুবি, ভাষা বে-পরোয়া। কিন্তু ব্যথাটুকু একেবারে মরমীর। এই সত্যিকারের ব্যথাটুকু থেকে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে, সে তাই অসাধ্য সাধনে সমর্থ হয়েছে, হাসির হাওয়া দিয়ে কান্নার জঞ্জাল সে উড়িয়ে নিতে বেরিয়েছিল, তার অভিযান নিষ্ফল হয়নি।

(— কল্লোল পত্রিকার চৈত্র,১৩৩২, সংখ্যায় মণীশ ঘটকের যুবনাশ্ব ছদ্মনামে 'আবোল তাবোল' গ্রন্থ প্রসঙ্গে রচনা থেকে সংকলিত অংশবিশেষ। লেখককৃত বানান অপরিবর্তীত রয়েছে।)

অসম্ভবের ছন্দকার সুকুমার রায়ের ১২৫ বর্ষ পূর্তিতে জেলার খবর সমীক্ষা পত্রিকার শ্রদ্ধার্ঘ্য

পরিচিত পরিচয়ের গণ্ডি পেরিয়ে একটু অন্যভাবে সুকুমারীয় জগৎকে খোঁজার চেষ্টা

তাঁর সম্বন্ধে অনেক অল্প জানা, অজানা বা একেবারে না জানা বিষয়কে নতুন করে তুলে ধরে বহুমুখী প্রতিভার নব-মূল্যায়নের একেবারেই আবোল তাবোল প্রচেষ্টা

বিশেষ সুকুমার সংখ্যা

‘শিক্ষা আনে চেতনা’

সম্পাদকীয়

শারদোৎসব শেষ হলেও বাঙালীর উৎসবের শেষ হয়নি। সামনেই দীপান্বীতা, আলোর উৎসব। সেই উৎসবের সাথেই এসে পড়বে ভাই-বোনের চিরন্তন স্নেহের উৎসব ভাইফোঁটা। এসব মিটতে মিটতে স্কুল কলেজে বার্ষিক পরীক্ষা শুরুর ঘন্টা বেজে যাবে। উৎসবের ভালোলাগা মিলিয়ে যাবে দৈনন্দিন কাজের চাপে। এই নিত্যকার বাস্তবতা থেকে যিনি মুহুর্তে আমাদের অবাস্তব আজগুবি জগতে নিয়ে গিয়ে সব সমস্যা হটিয়ে দিয়ে ক্ষণিকেই অনাবিল আনন্দ দিতে পারেন সেই অসম্ভবের ছন্দকার সুকুমার রায়কে আজ সবচেয়ে বেশী করে দরকার হয়ে পড়েছে। চারিদিকেই অনুকরণপ্রিয়তা এতটাই প্রকট হয়ে উঠেছে যে ‘হাঁসজারু’, ‘হাতিমি’, ‘গিরগিটিয়া’দের ‘বকচ্ছপ মূর্তি’ আজ বাস্তবের চরিত্র। আমাদের ‘আইন কানুন সব্বনেশে’ হয়ে উঠতে আজ আর দেরি লাগে না। ‘কথার পাকে মানুষ মেরে / মাকড়্জীবী ঐ যে ফেরে’ বলে কবি যাদের সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন তাদের নানান রূপে আমরা আশেপাশে দেখতে পাই। তারা মুখে বলে ‘ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারব না’, ভাব দেখায় ‘মনটা আমার বড্ড নরম, হাড়ে আমার রাগটি নেই’, কিন্তু তাদের কথা মতো না চললেই তারা হুঙ্কার দিয়ে ওঠে ‘অভয় দিচ্ছি, শুনছ না যে? ধরব নাকি ঠ্যাং দু’টা?’ তাই আমাদের কাছে তাঁর সরল জিজ্ঞাসা ‘দুষ্টু লোকের মিষ্টি কথায় / নাচলে লোকের স্বস্তি কোথায়?’ কিন্তু আমাদের যে ‘সিংহের কেশরের মতো ... তেজ’, ‘গোসাপের খাঁজকাটা লেজ’ চাই, কারণ ‘ক্যাঙ্গারুর লাফ দেখে ভারি ... হিংসে’ জাগে আর সেই সাধ পূরণে অসাধ্য সাধন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যে অবস্থা দাঁড়ায় তখন ‘নই জুতা নই ছাতা, আমি তবে কেউ নই!’ বলা ছাড়া আর উপায় থাকে না। ‘রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা’র ওপর বসেও আমরা সব কিছুই ‘খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না’ ভাবে সহ্য করে চলেছি। কারণ আমরা আমাদের দৌড় জানি, আর জানি বলেই এও মানি ‘রামু হও দামু হও ওপাড়ার ঘোষ বোস — / যেই হও এইবার থেমে যাবে ফোঁসফোঁস।’ তখন নিজের দোষ ঢাকতে ‘গোপালটা কি হিংসুটে মা!’ বলে নালিশ করতে শুরু করে দেব আর আমাদের চেয়ে ছোট অর নরমদের বলব ‘চাইবে যদি কিচ্ছু তখন, ধরব গলা চিপটে।’ এক অসম্ভবের রাজ্যে বাস করে আমরা সব সম্ভব করার চেষ্টা করে চলেছি। ‘আলোয় ঢাকা অন্ধকার’কে দূর করে আমরা সবাই চাই সেই জগৎ, যেখানে ‘রঙিন আকাশ তলে / স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে, / সুরের নেশায় ঝরনা ছোটে, / আকাশ কুসুম আপনি ফোটে,’। সেই রাঙা আকাশের রঙে মন রাঙিয়ে, চমক জাগিয়ে ‘আপনাকে আজ আপন হতে’ খেয়ালের স্রোতে ভাসিয়ে দিতে চাই বলেই আমাদের প্রিয় কবিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। জন্মের ১২৫ বছর পরেও তাঁর লেখনি একই রকম ধারালো, জোরালো, প্রাসঙ্গিক আবার বিশ্বজনীন। ‘লাল গানে নীল সুর, হাসি হাসি গন্ধ’কে কমিউনিজমের ক্যাপিটালিজমে পরিণত হওয়ার আন্তর্জাতিক ইতিহাসের ভবিষ্যদ্বাণী ভেবে নেওয়াটা অমূলক নয়। তাঁর সমস্ত আপাত অর্থহীন লেখার পরতে পরতে মানব জীবনের নানা অসঙ্গতিই তো জড়িয়ে আছে। আমরাও জড়িয়ে আছি তাঁর সাথে।

জেলার খবর সমীক্ষা’র গ্রাহক হন।
— শারদ সংখ্যা (২০ টাকা) সমেত —
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৬০ টাকা
লেখা পাঠান, মনোনীত হলে তা প্রকাশ করা হবে।
পত্রিকা সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত জানান।
যোগাযোগ করুন — সম্পাদকীয় দপ্তরে
গ্রাম ও পোঃ - অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া।
ফোন - ৯৮০০২৮৬১৪৮

ছবিতে সুকুমার

সন্দেশের সম্পাদক সুকুমার

বিলেতে পড়ার সময় সুকুমার

পুত্র সত্যজিতের রেখায় সুকুমার

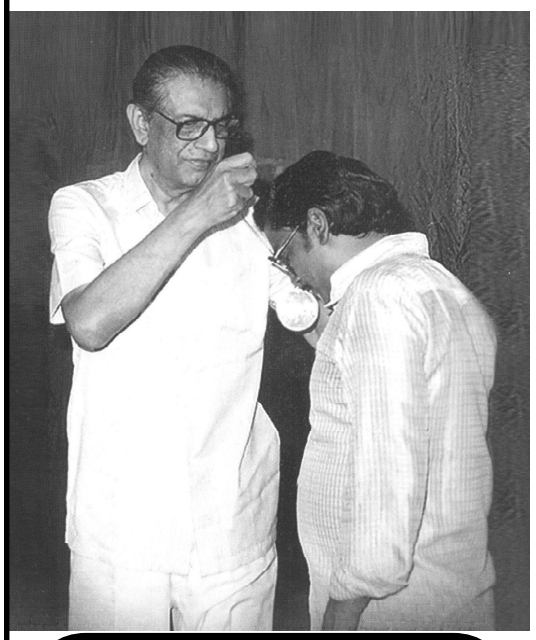

সুকুমার রায় শতবার্ষিকী পুরস্কার

১৯৮৮ সালের ২ এপ্রিল কলকাতার অবন মহলে সুকুমার পুত্র কিংবদন্তী চিত্রপরিচালক, বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে ‘সুকুমার শতবার্ষিকী স্বর্ণপদক’ গ্রহণ করছেন কবি **ভবানী প্রসাদ মজুমদার**।

সুকুমার রায়ের ১২৫বছর পূর্তিতে কবি **ভবানী প্রসাদ মজুমদার** তাঁর লেখায় অসম্ভবের ছন্দকারকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে হাজির করেছেন।

অমলিন আজও

ছড়ার রাজা সুকুমার রায় চির-অমলিন ও-নাম
একশো পঁচিশ বর্ষে তোমায় জানাই প্রাণের প্রণাম।
ছড়ার রাজা সুকুমারের একশো পঁচিশ বর্ষে
সবার হৃদয় উঠুক নেচে তাঁর সৃষ্টির স্পর্শে।

বুদ্ধি-জ্ঞানে সবার সেরা, নইকো বোকা-হাঁদা
তাইতো আমায় সবাই এখন বলে ‘দাশুদাদা’।
‘পাগলা দাশু’ ব’লে আর কেউ দিও না টিটকিরি
টি. ভি. খুললেই দেখবে কেমন করছি ‘দাদাগিরি’।

হাতিমি-বকচ্ছপ, হাঁসজারু-বিছাগল
সুকুমার রায় সব গড়েছেন অবিকল।
কবির কল্পনাকে সম্মান দিয়ে বলি
অভিনব সৃষ্টি এ-যুগের ক্লোনড্ ডলি।

হাসছি মোরা, হাসছি দেখ, হাসছি মোরা আহ্লাদি
সবাই মিলে হা হা - হো হো হরেক হাসির পাল্লা দি।
স্বাস্থ্য ভালো রাখতে গেলে হাসির সাথেই করুন ভাব
পাড়ায়-পাড়ায় মোড়ে-মোড়ে তুলুন গড়ে ‘লাফিং ক্লাব’।

সুকুমারের ধাঁধা ছড়া দিয়ে বাঁধা

১
ছিল সে সাগর মাঝে, মাছ নয় কভু সে,
আকাশে উড়িল বটে, পাখী নয় তবু সে।
মাঝে মাঝে দিনে রাতে শুনি তার হাঁক ডাক —
সহসা ডাঙায় নামে দলে বলে লাখ লাখ।

২
যত কর মারপিট ডাক ছেড়ে তেড়ে,
মাথা কাট, কথা কওয়া তবু যায় বেড়ে!
তল মিলে সহজেই, বাদ দিলে পেটে—
বুঝে দেখ তোমারি সে, ল্যাজখানি কেটে।

৩
দুইটি আকার দেখি তবুও সে নিরাকার
দেখেও দেখিনে তারে চলে ফিরে বারেবার,
আবার সাকার হ’লে কত স্বাদ পাই রে
টপাটপ মুখে ফেলি মজা ক’রে খাই রে।

৪
কভু থাকি ঘাড়ে পিঠে কভু থাকি পাতা
সকালেতে কত লোকে খায় মোর মাথা।
মুড়োকাটা ধড় পাবে বাজারের দরে
গণ্ডা পুরাতে পার ল্যাজা মুড়া ধ’রে।।

৫
মুখখানি কালো করে শুয়ে ছিল ঘরে
ঘর খুলে তবু তারে টেনে আনি ধ’রে!
গুঁতা খেয়ে ফঁস ক’রে তেজ যত মুখে—
আপন বাসার পাশে মরে মাথা ঠুকে।

৬
সার বেঁধে দুই দল আছি মুখামুখি
প্রতিদিন রেষারেষি চলে ঠোকাঠুকি
একবার পড়ে পড়ে ফের উঠি তেড়ে
আবার পড়িলে যাবে রণভূমি ছেড়ে।

৭
আগে ডাকি আয় আয় শেষে করি মানা
উল্টা স্বভাব মোর আছে তোর জানা!
নূতন শিখায়ে কেবা ঠকাইবি মোরে?
যা দেখাবি ফিরে দেখাইব তোরে।।

৮
বারো মাস এক কথা, একই সুর শুনি তার,
তবু তারে হাতে ধ’রে মুখ দেখি বারে বার।

৯
কলের মধ্যে পা দিয়েছ তাইত আমায় পেলে
বিপদ হলে দোষটা সবাই আমার ঘাড়েই ফেলে।

১০
বাঁকা মাথা, এক ঠ্যাং, ঢলঢলে জামা গায়—
ঠেলা খেয়ে ফুলে ওঠে — তোমরা চেন কি তায়?

১. জল, মেঘ ও বৃষ্টি, ২. তবলা, ৩. বাতাস, ৪. চাদর, ৫. দেশলাই কাঠি, ৬. দাঁত, ৭. আয়না, ৮. হাতঘড়ি, ৯. কপাল, ১০. ছাতা।

২০১৩'র ১জানুয়ারী সংখ্যা থেকে 'জেলার খবর সমীক্ষা' পত্রিকায় ছোটদের জন্য একটি নিয়মিত বিভাগ শুরু হয়েছে। এই বিভাগটির উদ্দেশ্য ছোটদের ভাবনাকে প্রকাশ করা, তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া। অনেক নামি দামি পত্রিকাতেই ছোটোদের পাতা আছে। তাতে ছোটদের আঁকা, লেখাও নিয়মিত প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাদের সঙ্গে জেলার খবর সমীক্ষা পত্রিকার 'ছোটদের পাতা'র পার্থক্য আছে। পত্রিকার এই বিভাগটি ছোটদের দ্বারাই পরিচালিত হবে। ছোটরাই বিষয়বস্তু ঠিক করবে, তথ্য ও খবর সংগ্রহ করবে। সেই সব তথ্য খবরকে বিষয় করে তারাই রূপ দেবে 'ছোটদের পাতা'কে। ছোটদের পাতা'য় কোনো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলে তার সেরা বাছাইয়ের দায়িত্বও ক্ষুদে বিচারকদের।

তোমরা যারা এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হতে চাও তারা শীঘ্রই যোগাযোগ কর। তাছাড়া, কেমন লেখা পড়তে চাও, কি বিষয়ে জানতে চাও এসবও লিখে জানাতে পারো।

প্রথম গ্রন্থ 'আবোল তাবোল' প্রকাশিত হওয়ার ন'দিন আগে সুকুমার রায়ের প্রয়ান ঘটে। বই ছাপার কাজ নিজে তদারকি করলেও ছাপার আকারে বই দেখে যেতে পারেননি। 'আবোল তাবোল' গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা সন্দেশে প্রকাশিত হয়েছিল। বই আকারে প্রকাশের সময় তিনি কবিতাগুলির নানান অদল বদল ঘটান। অনেক কবিতা পাণ্ডুলিপি থেকে ছাপার সময় বদল ঘটিয়েছেন। সেই অদল বদল গুলির মধ্যে তিনটি কবিতার রদ-বদল তোমাদের কাছে তুলে ধরছি তোমাদের জন্য, তোমাদের পাতায়। তোমরা যারা কবিতা লিখতে চাও তারা এথেকে কবিতা কিভাবে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে সেটা জানতে পারবে।

'কাঠবুড়ো'

কবিতাটি প্রথমে 'আবোল তাবোল' নামেই লেখা হয়। বইয়ে ছাপার সময় কিছু রদ-বদল ঘটান। সেই প্রথমে লেখা লাইনগুলো (ব্র্যাকেটের মধ্যে) দেখানো হল। কবিতার মোট ৭টি লাইনে তিনি কিছু রদ বদল করেছেন এবং ২টি লাইন সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। তলায় দাগ দেওয়া লাইন দু'টি বইতে সম্পূর্ণ বাদ পড়েছে। কবিতার দুটি রূপই একসাথে দেখে নাও।

হাঁড়ি নিয়ে দাড়ি মুখো কে-যেন কে বৃদ্ধ,
রোদে ব'সে চেটে খায় ভিজে কাঠ সিদ্ধ।
মাথা নেড়ে গান করে, গুণ গুণ সঙ্গীত,
ভাব দেখে মনে হয় না-জানি কি পণ্ডিত।
বিড্ বিড্ কি যে বকে নাহি বুঝি অর্থ —
('আকাশেতে ঝুল নাই, কাঠে নাই গর্ত্ত?' —)
'আকাশেতে ঝুল ঝোলে, কাঠে তাই গর্ত।'
(টেকো মাথা তেতে ওঠে গায়ে ছোটে ঘর্ম্ম,)
টেকো মাথা তেতে ওঠে গায়ে ছোটে ঘর্ম,
(রেগে বলে 'কেবা বোঝে এসবের মর্ম্ম —)
রেগে বলে 'কেবা বোঝে এসবের মর্ম?
(আরে মোলো, যে-ব্যাটারা একেবারে অন্ধ,)
আরে মোলো, গাধাগুলো একেবারে অন্ধ,
(বুদ্ধির ঢেঁকি যারা নাহি ছিরি ছন্দ।)
বোঝে নাকো কোনো কিছু খালি করে দ্বন্দ্ব।
(কোন্ কাঠে কত রস সেদিকেতে মন নাই —)
কোন্ কাঠে কত রস জানে নাকো তত্ত্ব—
(কাঠকে যে কাষ্ঠ কয়, এত বড় অন্যায়!)
(তারা কি মানুষ ? তারা জানে কোনো তত্ত্ব —)
(পূর্ণিমার রাতে কেন কাঠে হয় গর্ত্ত?')
একাদশী রাতে কেন কাঠে হয় গর্ত্ত?'
আশে পাশে হিজিবিজি আঁকে কত অঙ্ক,
ফাটা কাঠ ফুটো কাঠ হিসাব অসংখ্য,
কোন ফুটো খেতে ভাল কোনটা বা মন্দ,
কোন কোন ফাটলের কি রকম গন্ধ।
কাঠে কাঠে ঠুকে করে ঠকাঠক্ শব্দ,
বলে 'জানি কোন্ কাঠ কিসে হয় জব্দ।
কাঠকুটো ঘেঁটেঘুঁটে জানি আমি পষ্ট,
একাঠের বজ্জাতি কিসে হয় নষ্ট।
কোন কাঠ পোষ মানে, কোন কাঠ শান্ত,
কোন কাঠ টিম্‌টিমে কোনটা বা জ্যান্ত।
কোন কাঠে জ্ঞান নাই মিথ্যা কি সত্য,
আমি জানি কোন কাঠে কেন থাকে গর্ত্ত।'

'ভালো রে ভাল'

দু'পাশের কবিতা দু'টির মতই এই কবিতাটিও প্রথমে যে রূপ ছিল বইয়ে তার অনেকটাই বদল হলেও নামের হেরফের ঘটেনি। দু ক্ষেত্রেই নাম একই 'ভালো রে ভাল'। প্রথমে 'আবোল তাবোল' বইয়ে যেমন ছাপা আছে সেটা -

দাদা গো! দেখ্‌ছি ভেবে অনেক দূর -

এই দুনিয়ার সকল ভাল, আসল ভাল নকল ভাল,
শস্তা ভাল দামীও ভাল, তুমিও ভাল আমিও ভাল,
হেথায় গানের ছন্দ ভাল, হেথায় ফুলের গন্ধ ভাল,
মেঘ মাখানো আকাশ ভাল, ঢেউ-জাগানো বাতাস ভাল,
গ্রীষ্ম ভাল বর্ষা ভাল, ময়লা ভাল ফরসা ভাল,
পোলাও ভাল কোর্মা ভাল, মাছপটোলের দোলমা ভাল,
কাঁচাও ভাল পাকাও ভাল, সোজাও ভাল বাঁকাও ভাল,
কাঁসিও ভাল ঢাক্‌ও ভাল, টিকিও ভাল টাকও ভাল,
ঠেলার গাড়ী ঠেলতে ভাল, খাস্তা লুচি বেলতে ভাল,
গিট্‌কিরি গান শুনতে ভাল, শিমূল তুলো ধুন্‌তে ভাল,
ঠাণ্ডা জলে নাইতে ভাল, কিন্তু সবার চাইতে ভাল

— পাউরুটি আর ঝোলা গুড়।

এবার দেখো কবিতাটি কবির লেখার খাতায় কেমন ছিল। প্রথমের লেখায় কিন্তু ভালর হিসেব ছিল অনেক বেশী।

দাদা গো! দেখ্‌ছি ভেবে অনেক দূর -

এই দুনিয়ার সকল ভাল আসল ভাল নকল ভাল
শস্তা ভাল দামীও ভাল তুমিও ভাল আমিও ভাল
পোলাও ভাল কোর্মা ভাল মাছপটোলের দোলমা ভাল
চালকুমড়োয় চালতা ভাল ঝিঙের টকে পলতা ভাল
পদগুলোয় ছন্দ ভাল পদ্মফুলের গন্ধ ভাল
সুনীলবরণ আকাশ ভাল মন্দ মলয় বাতাস ভাল
কাঁচাও ভাল পাকাও ভাল সোজাও ভাল বাঁকাও ভাল
কাঁসিও ভাল ঢাক্‌ও ভাল টিকিও ভাল টাকও ভাল
খেলাও ভাল পড়াও ভাল মিঠেও ভাল কড়াও ভাল
কালও ভাল আজও ভাল ফাঁকিও ভাল কাজও ভাল
লাঠিও ভালো ছাতিও ভাল ঘুঁষিও ভালো লাথিও ভাল
গ্রীষ্ম ভাল বর্ষা ভাল ময়লা ভাল ফরসা ভাল
ঠেলার গাড়ী ঠেলতে ভাল খাস্তা লুচি বেল্‌তে ভাল
গিট্‌কিরি গান শুনতে ভাল শিমূল তুলো ঠুনতে ভাল
ঠাণ্ডা জলে নাইতে ভাল কিন্তু সববার চাইতে ভাল

— পাউরুটি আর ঝোলা গুড়।

'কুমড়োপটাশ'

এই কবিতাটিও প্রথমে 'আবোল তাবোল' নামেই লেখা হয়। বইয়ে ছাপার সময় কিছু রদ-বদল ঘটেছে এই কবিতাটিতেও। কবিতাটির প্রথমে লেখা লাইনগুলো (ব্র্যাকেটের মধ্যে) দেখানো হল। তলায় দাগ দেওয়া লাইন দু'টি বইতে সম্পূর্ণ বাদ পড়েছে। বাঁকিয়ে লেখা পংক্তিটি সম্পূর্ণ নতুন। প্রথমে ছাপা হয়নি, বইতে এই পংক্তিটি ছাপা হয়।

(যদি) কুমড়োপটাশ নাচে —
(খবরদার কেশ' না কেউ আস্তাবলের কাছে!)
খবরদার এসো না কেউ আস্তাবলের কাছে,
চাইবে নাকো ডাইনে বাঁয়ে চাইবে নাকো পাছে.
চার পা তুলে থাকবে ঝুলে হট্টমুলার গাছে।

(যদি) কুমড়োপটাশ কাঁদে —
(খবরদার! খবরদার! যেয়ো না কেউ ছাদে,)
খবরদার! খবরদার! বসবে না কেউ ছাদে,
উপুড় হয়ে মাচায় শুয়ে লেপ কম্বল কাঁধে,
(বেহাগ সুরে গাইবে খালি 'রাধে কেষ্ট রাধে'।)
বেহাগ সুরে গাইবে খালি 'রাধে কৃষ্ণ রাধে'।

(যদি) কুমড়োপটাশ হাসে —
থাকবে খাড়া একটি ঠ্যাঙে রান্নাঘরের পাশে,
ঝাপ্‌সা গলায় ফার্সি কবে নিশ্বাসে ফিস্‌ফাসে,
(তিনটি বেলা উপোস রবে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে।)
তিনটি বেলা উপোস করে থাকবে শুয়ে ঘাসে।

(যদি) কুমড়োপটাশ ছোটে —
সবাই যেন তড়বড়িয়ে জানলা বেয়ে ওঠে,
হুঁকোর জলে আলতা গুলে লাগায় গালে ঠোঁটে,
ভুলেও যেন আকাশ পানে তাকায় নাকো মোটে।

(যদি) কুমড়োপটাশ ডাকে —
সবাই যেন শাম্‌লা এঁটে গামলা চড়ে থাকে,
ছেঁচকি শাকের ঘন্ট বেটে মাথায় মলম মাখে,
শক্ত ইঁটের তপ্ত ঝামা ঘষতে থাকে নাকে।

তুচ্ছ ভেবে এ-সব কথা করছে যারা হেলা,
কুম্‌ড়োপটাশ জানতে পেলে বুঝবে তখন ঠেলা।
(কুম্‌ড়োপটাশ চট্‌লে পরে ঘট্‌বে তখন কি যে,)
(বল্‌ব কি ছাই বুঝাই কারে বুঝতে না পাই নিজে।)
দেখবে তখন কোন্ কথাটি কেমন করে ফলে,
আমায় তখন দোষ দিওনা, আগেই রাখি ব'লে।

তুমিও লিখতে পারো ছোটদের পাতাতে। তোমাদের কবিতা গল্প আঁকায় ভরে উঠবে 'ছোটদের পাতা'। আর নিয়মিত এই কাগজটা সংগ্রহ করতে চাইলে আজই 'জেলার খবর সমীক্ষা'-র বার্ষিক গ্রাহক হয়ে যাও। বছরে মোট ২৪টি সংখ্যার জন্য তোমাকে দিতে হবে এককালীন ৪৫ টাকা। আর না হলে প্রতিটি সংখ্যা দু'টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করতে পারো। তোমার লেখা ও গ্রাহক হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

সুকুমারীয় ধাঁধা

সন্দেশের প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় সম্পাদক সুকুমার ধাঁধা বা হেঁয়ালি রচনা করতেন। সেই সব ধাঁধা যেমন ছিল অভিনব তেমনি তাতে ছিল বুদ্ধির ছাপ ও অনাবিল রসবোধ। দুষ্প্রাপ্য সেই ধাঁধা হেঁয়ালির মধ্যে থেকে কয়েকটি ধাঁধা তোমাদের জন্য।

ছবির ধাঁধা

সুকুমারের আঁকা ছবির ধাঁধাগুলি ছাপার ক্ষেত্রে কিছু জটিলতার জন্য তাদেরকে নতুন রূপে তোমাদের কাছে তুলে ধরলাম। এতে অবশ্য সুকুমারীয় মজা কোনো অংশেই কমবে না। প্রতিটা ছবিতেই একটা করে শব্দ লুকিয়ে আছে। শব্দগুলো নিজেরা বার করার চেষ্টা কর, তাতে মজা পাবে বেশী। আর একান্ত না পারলে? উত্তরের জন্য পরের সংখ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

১) কোন জায়গার নাম?

২) দু'টি ছবি মিলিয়ে কোন প্রাণীর নাম?

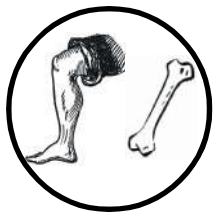

৩) কোন জিনিসের নাম?

৪) কোন প্রাণীর নাম?

বি৪

৫) বাংলা শব্দটি কি?

৬) কোন জায়গার নাম?

৭) কোন হাতিয়ার?

শব্দ বদল

ইংরাজিতে এক রকম ধাঁধা আছে, তাকে বলে 'ওয়ার্ড ট্রান্সফরমেশন' বা 'শব্দ বদল'। এতে এক একটা কথাকে অল্পে অল্পে বদলিয়ে তার জায়গায় নূতন কথা বানাতে হয়। যেমন — COAL—COAT— BOAT — BEAT— BELT — এর নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বারেই একটি মাত্র অক্ষর বদলিয়ে, তার জায়গায় অন্য একটি অক্ষর বসাতে হয় — আর প্রত্যেক বারেই একটা সত্যিকারের কথা হওয়া চাই। বাংলাতেও এরকম হতে পারে। যেমন — 'গামছা—গামলা—শামলা—শিমলা' অথবা 'বদন—বদল—বাদল—বাউল—চাউল'। নিয়ম এই যে, একবারে একটার বেশী পরিবর্তন করতে পারবে না — অক্ষর বাড়াতে বা কমাতে পারবে না। 'চা'কে বদলিয়ে 'আ' করতে পার, 'পা' করতে পার, 'চ' কিংবা 'চি' করতে পার — কিন্তু একেবারে 'প' করতে পারবে না।

এই নিয়মে কয়েকটি কথা বদ্‌লিয়ে দেখত —

ক। 'কালো'কে 'সাদা' কর।	চ। 'জুতো'কে 'মোজা' কর।	ট। 'মোকামা'কে 'নবনী' কর।
খ। 'গয়া'কে 'কাশী' কর।	ছ। 'বামন'কে 'চালাক' কর।	ঠ। 'সাবান'কে 'মলম' কর।
গ। 'ছাতা'কে 'লাঠি' কর।	জ। 'কুমীর'কে 'জামাই' কর।	ড। 'চসমা'কে 'ননদ' কর।
ঘ। 'দুধ'কে 'জল' কর।	ঝ। 'পোলাও'কে 'পয়সা' কর।	ঢ। 'নিবাস'কে 'লহরী' কর।
ঙ। 'সাপ'কে 'বেজী' কর।	ঞ। 'আকাশ'কে 'পাতাল' কর।	ণ। 'বাতাবি'কে 'কলম' কর।

লুকানো ধাঁধা

নীচের লেখাটির মধ্যে বারোটি ভেৌগোলিক নাম (নদী, নগর, দেশ ইত্যাদি) লুকানো আছে, খুঁজে বের কর :

তুমি বাপু রীতিমত কানা। ডানদিকে অত বড় বানিটা খুঁজেই পেলে না? আচ্ছা মজা। পানওয়ালার দোকানটার পরেই টালি বাঁধান আস্তাবল। তার পাশেই ত বাড়ি। না গিয়ে ঠকেছ। — কি খাওয়ার ধূম! একটা মাছের রায়তা ছিল, টক — টক ঝালপানা — ইনি তাল ঠুকে তেড়ে সাতবার তাই চেয়ে খেয়েঠেন। খাওয়ার পর পান দিল রূপোর রেকাবে, রীতিমত তাম্বুলীন দেওয়া মিঠে পান। খেয়ে উঠে যা রগড়! বোকা শিবদাসটা সবে হারমোনিয়াম নিয়ে গান ধরেছে, ''দেখরে নয়ান অতি সুমহান'' — দীনুটা অমনি করেছে কি, তার কানে পালক ঢুকিয়ে এক বিশ্রী হট্টগোল বাধিয়ে তুলেছে।

এর আগে যেমন লুকানো ভৌগোলিক নাম বের করলে, নীচের লেখার মধ্যে সেরকম ভাবে নয়টি পশু ও পাখীর নাম লুকানো আছে, — খুঁজে বের কর :

কাল রাত্রে রামা পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে পাশের বাড়ির ছাতে বেড়িয়ে এল, কেউ টের পায়নি। সে বাড়িতে ভাটিয়ারা থাকে, — বেজায় বড়লোক। বাড়িময় নানা রকম দামী জিনিষ সাজান। বাবুরাও খুব সৌখীন — কারো বা জরীর জুতো পায়, কারো পায় রাঙা জুতা। কেউ বা নরম পশমী জামা গায়, কেউ বা রেশমী জামা গায়। বৈছকখানা ঘরে বিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা কত ছবি রয়েছে! বড় বাবুর মেজাজটা বড়ই চড়া, ইস! সেদিন চাকরটাকে কি ধমকটাই দিলেন।

এক চোর আর এক চোরকে একটা সাংকেতিক চিঠি লিখে পাঠিয়েছে। নীচের চিঠিটা সেই চিঠিরই অংশ। তার মধ্যে আসল চিঠিটা লুকানো আছে। গুপ্ত চিঠিটা পড়ার সংকেতটাও খুবই সোজা, তোমরা একটু চেষ্টা করলেই বার করতে পারবে। — চোরটি অন্য চোরকে কি জানাতে চাইছে খুঁজে বের কর দেখি :

চোদ্দ রাত ইন্দুর মা ললিতের শিয়রে বসিয়া পুত্রসেবায় রত। পার্বতী ঠাকরুণ ইন্দু বেচারাকে দেখিতেই রীতিমত হয়রান। ইন্দ্রনাথটা লেখাপড়ায় সর্বাংশে মূর্খ, হরিশেরও বিশেষ পড়াশুনা দরকার। খুড়োমশাইকে বলিও, সারদা বলিল ধানবদে নেড়া চমৎকার লিচু বেচিতেছে।

কুইজ

বিষয় সুকুমার

৩০ অক্টোবর সুকুমার রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে তোমাদের জন্য রইল বিশেষ সুকুমার কুইজ। সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে থেকে একজন পাবে একটি লোভনীয় বই। তবে আর দেরি কেন, ঝটপট উত্তর পাঠিয়ে দাও আমাদের দপ্তরে।

১. সুকুমারের জন্ম হয়েছিল ১৮৮৭ সালের ৩০ অক্টোবর কলকাতার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়িতে। বাড়ির নম্বর কত ছিল ?

২. রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষী উপন্যাসের একটি চরিত্রের নামে উপেন্দ্রকিশোর সুকুমারের নাম রাখেন এবং সেই নামেই ডাকতেন। সেই নামটি কি?

৩. কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়িতেই একটি স্কুল ছিল। সেখানেই সুকুমারের পড়াশোনা শুরু হয়েছিল। সেই স্কুলের নাম কি ছিল?

৪. সুকুমারের ছেলেবেলার দিনগুলির কথা তাঁরই এক বোন একটি অসামান্য বইয়ে লিখেছেন। কে এবং কি নাম বইয়ের?

৫. প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দুটি বিষয়ে অনার্স নিয়ে সুকুমার বি. এস. সি. পাশ করেন। কোন কোন বিষয়?

৬. সুকুমার 'ননসেন্স ক্লাব'-এর জন্য একটি হাতে লেখা পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকার নাম কি ছিল?

৭. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি নিয়ে সুকুমার কোন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে বিলেতে গিয়েছিলেন?

৮. লণ্ডনে থাকার সময় সুকুমার রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যা 'কোয়েস্ট' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। প্রবন্ধটির নাম কি ?

৯. ১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তির বছরে সুকুমার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটি নাটকে অভিনয় করেন। নাটকটির নাম কি?

১০. সুকুমারের আঁকা অসংখ্য আশ্চর্য ছবির একটি। ছবিতে যে পাখিটিকে দেখা যাচ্ছে সেটি কোনো সাধারণ পাখি নয়। কি নাম এই পখিটির?

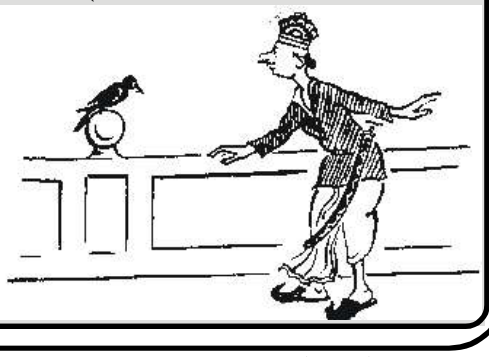

কুইজ

প্রতিমাসের ১তারিখের সংখ্যার কুইজের উত্তর থাকবে পরের মাসের ১তারিখের সংখ্যায় তেমনি প্রতিমাসের ১৫তারিখের সংখ্যার কুইজের উত্তর থাকবে পরের মাসের ১৫ তারিখের সংখ্যায়। এই সময়ের মধ্যে তোমরা কুইজের উত্তর পাঠাও। প্রতিসংখ্যার একজন করে সঠিক উত্তরদাতা পুরষ্কার পাবে। তাই আর দেরি না করে ঠিক উত্তর লিখে তোমার নাম ঠিকানা বয়স শ্রেণী এবং ফোন নম্বর দিয়ে আমাদের পাঠিয়ে দাও। ই-মেলেও যোগাযোগ করতে পারো এই ঠিকানায় — jaharchatterjee1969@gmail.com

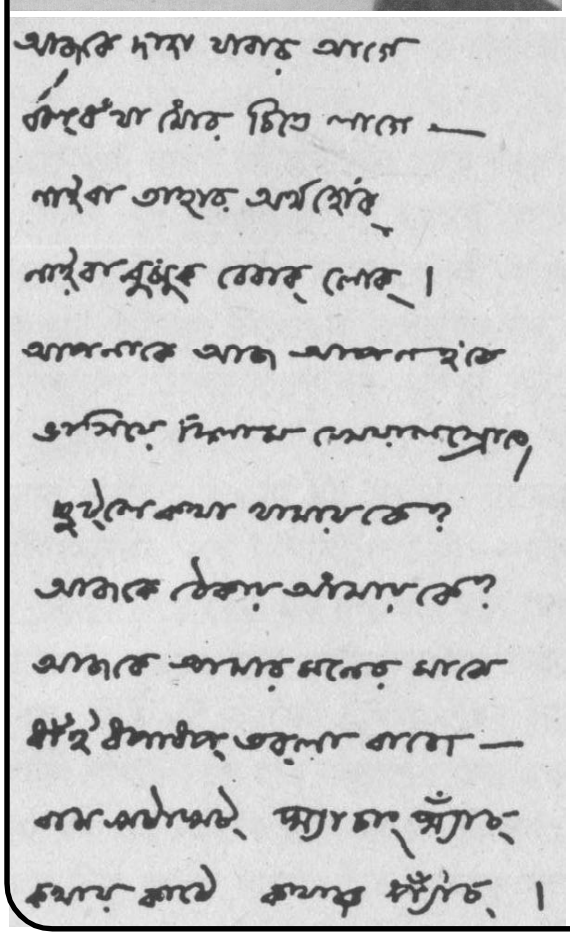

নানা রঙের সুকুমার

একবার উপেন্দ্রকিশোর তিন মেয়ের জন্য মেলা থেকে টবে বসানো ফুলগাছ কিনে এনেছেন। কবে ফুল ফুটবে সেই আশায় তিনজনেই গাছের যত্ন করছে। ফুল যখন ফুটল, সুখলতা আর পুণ্যলতার গাছে সুন্দর গোলাপী রঙের ফুল আর ছোটবোন শান্তিলতার গাছে সাদা ফুল। সাদা ফুল দেখে তো সে কেঁদে কেটে এক সা। পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখে তার গাছের সব ফুল লাল রঙের হয়ে গেছে। তখন তার আর খুশির সীমা নেই। অতটুকু মেয়ে বুঝেও পেলনা কি করে এমন হ'ল। মা বিধুমুখীদেবী গাছের টবের কাছে এক ফোঁটা লাল রং পড়ে থাকতে দেখলেন। বাড়ির আর কেউ বুঝতে না পারলেও তাঁর বুঝতে বাকি থাকল না এ সুকুমারের কীর্তি। ছোটবোনকে খুশি করতে তিনি রাতের অন্ধকারে সাদা ফুলে লাল রং করে দিয়েছেন।

●

ছোটবেলা থেকেই ছড়া লেখায় বিশেষত ছন্দ-মিলে সুকুমারের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ভাইবোন ও পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে প্রায়ই ছড়াকাটার আসর বসাতেন। সেই আসরে একজন কবিতার একটি লাইন বলত, আরেকজনকে তার সাথে মিল দিয়ে পরের লাইনটি বলতে হ'ত। একদিন এমনই সান্ধ্য আসরে ছড়াকাটা শুরু হল —

একদা এক বাঘের গলায় ফুটেছিল অস্থি,
যন্ত্রণায় কিছুতেই নাহি তার স্বস্তি,
তিনদিন তিনরাত নাহি তার নিদ্রা,
সেঁক দেয় তেল মাখে লাগায় হরিদ্রা,

এরপর আরো কয়েক লাইন কবিতা গড়গড় করে চলতে লাগল। গোল বাধল যখন মুক্তিদারঞ্জন বললেন 'ভিতরে ঢুকায়ে দিল দীর্ঘ তার চঞ্চু'। কেউ আর মিল দিতে পারে না। কিন্তু সুকুমার সবাইকে অবাক করে লাইন মিলিয়ে দিলেন, 'বক সে চালাক অতি চিকিৎসক চুঞ্চু'। আসলে 'চুঞ্চু' মানে যে 'ওস্তাদ' তা তো সুকুমার ছাড়া আর কারে জানাই ছিল না।

●

উপেন্দ্রকিশোরের কাছে কলকাতার সব বড় মানুষরাই আসতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, শিবনাথ শাস্ত্রী, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমূখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের সুকুমারের নিজের বাড়িতে আসতে দেখতেন। পড়াশোনায় ভালো হওয়ায় সবার কাছে ভাল ছেলে হিসাবে তাঁর কদর ছিল। তার সঙ্গে তাঁর দুরন্ত বুদ্ধি ও রসবোধ সকলকে মুগ্ধ করত। একবারর শিবনাথ শাস্ত্রী বাড়ির ছোটদের এক হাঁড়ি সন্দেশ দেখিয়ে বললেন কে সব সন্দেশ খেতে পারবে? ছোট সুকুমার সবার আগে বলে উঠল 'আমি পারি', তারপরই নিচু গলায় বলে 'কিন্তু অনেকদিন ধরে'।

●

বিলেত থেকে ফিরে 'ননসেন্স ক্লাব'-এর বিকল্প হিসাবে তৈরী করেন 'মন্ডে ক্লাব'। বেশিরভাগ সময় সোমবার সভা বসত বলে এই নামকরণ। অভিনয়, আলোচনা, সাহিত্যপাঠ সবকিছুই চলত সেখানে। সুকুমারকে ঘিরে 'মন্ডে ক্লাব'এ দল বেঁধেছিলেন কালিদাস নাগ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশ, অতুলপ্রসাদ সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রমূখ যাঁরা পরবর্তীতে এক একজন স্ব স্ব ক্ষেত্রে নক্ষত্র হয়ে ওঠেন। সভার আলোচনার বিষয়গুলি ছিল বিভিন্ন রকমের এবং গুরুগম্ভীর। যেমন বিবেকানন্দ, স্ট্রিণ্ডবার্গ, তুর্গেনিভ বা প্লেটোকে নিয়ে আলোচনা হত তেমনই বাংলা আঞ্চলিক ভাষা বা পাট শিল্প নিয়েও আলোচনা হত। আলোচনা যেমন প্রচুর হত, তেমনই খাওয়া-দাওয়াও হত প্রচুর। সুকুমার তাই মজা করে ক্লাবের নাম বদলে 'মণ্ডা ক্লাব' করার কথা বলতেন।

●

সুকুমারের পৈতৃকসূত্রে পাওয়া জমিদারী ছিল ময়মনসিংহের মসূয়াতে। সেখানকার প্রজারা খাজনা নিতে আসার জন্য সুকুমারের কাছে আমন্ত্রণ পাঠালেন। তাদের নুরোধ রাখতে সুকুমারকে জমিদারীতে যেতেই হল। সেখানে যেতেই শুনতে হল, কার কার খাজনা বাকি, কত খাজনা বাকি। কেউ কেউ এসে তাঁর পায়ের কাছে গিনি রেখে ভেট দিল। অনভ্যস্ত সুকুমার 'এসব কি?' জানতে চাইলে প্রজারা বলে এগুলো তাদের প্রণামী। সুকুমার তৎক্ষণাৎ 'এসব আমি চাইনা। নিয়ে যাও সব, সব ফিরিয়ে নাও,' বলে যে যা দিয়েছিল তাকে তা ফিরেয়ে দিলেন। বুঝলেন জমিদারী তার দ্বারা হবে না। তাই আসার সময় বলে এলেন, 'আমি আর আসছি না, তোমরা হিসেবমতো যার যেমন কাজ করো।'

●

সুকুমারের চোখে রবীন্দ্রনাথের আসন ছিল অনেক উঁচুতে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে তিনি জীবনের সত্য বলে মনে করতেন। সে সময় রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে এমন একদল অন্ধ স্তাবক থাকত যাঁদের সুকুমার পছন্দ করতেন না। এই স্তাবকদের ব্যঙ্গ করে 'ভাবুক দাদা' নামে কবিতায় লেখা একটি ছোট্ট নাটিকা তৈরী করেন। রবীন্দ্রনাথ নাটকটি পড়ে ঠাট্টা করে বলেছিলেন নাটকের কেন্দ্র চরিত্র ভাবুক দাদাটি তাঁকে ভেবেই লেখা। তবে সুকুমারের পক্ষে যে তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করা সম্ভব নয় তা তিনি নিজেও জানতেন। কারণ লণ্ডনে রোদেনস্টাইনের উপস্থিতিতে সুকুমার 'দি স্পিরিট অফ রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি পড়ে শোনান। পরে প্রবন্ধটি লণ্ডনের বিখ্যাত 'কোয়েস্ট' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এটি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোনো ভারতীয়ের লেখা প্রথম ইংরেজী প্রবন্ধ যা বিদেশের পত্রিকায় ছাপা হয়। এই প্রবন্ধটি ইউরোপে রবীন্দ্রনাথকে পরিচিত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল সেটি ঐতিহাসিক সত্য।

●

উপেন্দ্রকিশোর ১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ১৩২২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত 'সন্দেশ'-এর মোট ৩২টি সংখ্যার সম্পাদনা করেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দের পৌষ (২০ ডিসেম্বর, ১৯১৫) মাসে উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর 'সন্দেশ'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব নেন সুকুমার। ১৩২০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'সন্দেশ'-এ সুকুমারের 'বেজায় রাগ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এটিই তাঁর লেখা প্রথম কবিতা যা 'সন্দেশ'-এ ছাপা হয়। 'সন্দেশ'-এর পাতায় তাঁর লেখা প্রথম গল্প 'ওয়াসিলিসা'। এটি ছাপা হয়েছিল ঐ বছরের চৈত্র সংখ্যায়। সম্পাদক হওয়ার পর 'সন্দেশ'-এর পাতায় পাতায় তাঁর সৃষ্টিকর্ম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মোট ১২৬টি কবিতা, ৬৬টি গল্প, ৫টি নাটক, ১২১টি প্রবন্ধ, ৬৪টি ধাঁধা ও হেঁয়ালি 'সন্দেশ'-এ ছাপা হয়েছে। এর মধ্যে 'সম্পাদকের দশা' কবিতাটি এবং দু'টি নাটক তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। কোনো কোনো সংখ্যায় সুকুমারকে ছয়-সাতটি কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক লিখতে হয়েছে। অবশ্য কোনো লেখাতেই সুকুমারের নাম ছাপা হ'ত না। 'সন্দেশ'-এর রীতি ছিল সম্পাদকের নামে কোনো লেখা না ছাপার। তাই এই সব লেখা সুকুমারের নাম ছাড়াই প্রকাশিত হয়।

●

চিত্র পরিচিতি

উপরে - ভাইবোনেদের সঙ্গে সুকুমার (*সুকুমার ছবির ডানদিকে বসে, পাশে দাঁড়িয়ে বড়বোন সুখলতা ও মেজ বোন পুণ্যলতা, সামনে বসে ছোটবোন শান্তিলতা*) |
মাঝে - সুকুমার ও সুপ্রভা রায় / **নীচে** - সুকুমারের হস্তাক্ষর (*এটি সুকুমারের শেষ লেখা কবিতা*)

প্রথম সুকুমার

প্রথম প্রকাশিত কবিতা

সুকমার রায়ের প্রথম প্রকাশিত কবিতাটির নাম ‘নদী’। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত ‘মুকুল’ পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়। তখন সুকুমারের বয়স মাত্র ৮ বছর। এখানে সুকুমারের সেই প্রথম রচনাটি পুণর্মুদ্রিত হ’ল।

নদী

হে পর্বত, যত নদী করি নিরীক্ষণ,
তোমাতেই করে তারা জনম গ্রহণ।
ছোট বড় ঢেউ সব তাদের উপরে,
কল্‌কল্‌ শব্দ করি সদা ক্রীড়া করে,
সেই নদী বেঁকে চুরে যায় দেশে দেশে,
সাগরেতে পড়ে গিয়া সকলের শেষে।
পথে যেতে যেতে নদী দেখে কত শোভা,
কি সুন্দর সেই সব কিবা মনোলোভা।
কোথাও কোকিলে দেখে বসি সাথী সনে,
কি সুন্দর কুহু গান গায় নিজ মনে।
কোথাও ময়ূরে দেখে পাখা প্রসারিয়া
বনধারে দলে দলে আছে দাঁড়াইয়া!
নদীতীরে কত লোক শ্রান্তি নাশ করে,
কত শত পক্ষী আসি তথায় বিচরে।
দেখিতে দেখিতে নদী মহাবেগে ধায়,
কভুও সে পশ্চাতেতে ফিরে নাহি চায়।

প্রথম নাটক

১৯০৫ সালে সুকুমার ‘রামধন বধ’ নামে প্রথম নাটকটি রচনা করেন। নাটকটি তিনি অভিনয়ও করেছিলেন। এই নাটকের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি তাই কোথাও প্রকাশিত হয় নি। সুকুমারের মেজ বোন পুণ্যলতা চক্রবর্তীর লেখা ‘ছেলেবেলার দিনগুলি’থেকে সুকুমারের এই প্রথম নাটকটির কথা জানা যায়।

সেই লেখা থেকে জানা যায়, রামস্‌ডেন সাহেবকে ছেলেরদল কিবাবে জব্দ করে তা নিয়েই ‘রামধন বধ’ নাটক। অর্থাৎ রামধন হল রামস্‌ডেন সাহেবের নামের বঙ্গীকরণ। রামস্‌ডেন সাহেব ছিলেন মস্ত সাহেব, আসল সাহেবরা তার ধারেকাছে লাগত না। ভারতীয় দেখলেই সে ‘নেটিভ নিগার’ বলে নাক শিঁটকায়, তাই পাড়ার ছেলেরা তাকে দেখলেই ‘বন্দেমাতরম’ বলে চেঁচায়। ‘বন্দেমাতরম’ শুনলেই সে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে ছেলেদের গালাগাল দিয়ে তেড়ে মারতে আসত। শেষ পর্যন্ত পাড়ার ছেলেদের হাতে তাকে নাকাল হ’তে হয়। মজার এই নাটকে মজার মজার গানও ছিল।

যে সময় এই নাটকটি রচিত হয়েছিল সেটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। এই আন্দোলন যে সুকুমারকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল তা এই নাটকের বিবরণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। তবে ইতিহাসের বড় চরিত্র বা ঘটনাকে বিষয় না করে ছোটো ছোটো ত্রুটিগুলিকে নিয়ে মজা করার উদ্দেশ্যেই সুকুমার এই নাটক রচনা ও অভিনয় করেন। এই সময় ননসেন্স ক্লাব প্রতিষ্ঠা হলে ভাই বন্ধুদের নিয়ে অভিনয় করার জন্য তিনি নাটক লেখা শুরু করেন। সেইসব নাটকের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করা ছাড়াও সকলকে অভিনয়ও শেখাতেন তিনিই।

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ

১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর সুকুমার রায়ের মৃত্যু হ’য়। মৃত্যুর ৯দিন পর, ১৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয় সুকুমার রায়ের প্রথম বই ‘আবোল তাবোল’। ছাপা অবস্থায় বই না দেখতে পেলেও বইয়ের তিন রঙের মলাট, ভিতরের সাজসজ্জা, ছবি সবই তিনি নিজে হাতে করে গেছিলেন।

সুকুমারের মৃত্যুর এক বছর পর ‘ইউ রায় এণ্ড সন্স’ থেকে প্রকাশিত হয় সুকুমার রায়ের প্রথম গদ্যের বই ‘হ য ব র ল’। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে সন্দেশ পত্রিকায় প্রথম বের হয়।

সুকুমারের মৃত্যুর ১৭ বছর পর ১৯৪০ সালে ‘এম সি সরকার এণ্ড সন্স’ থেকে প্রকাশিত হয় সুকুমার রায়ের প্রথম গল্প সংকলন ‘পাগলা দাশু’। সুপ্রভা রায়ের অনুরোধে এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন সুকুমার পুত্র সত্যজিৎ রায়। এটিই সত্যজিতের করা প্রথম প্রচ্ছদ।

১৯৫৪ সাল থেকে ভারত সরকার শিশু সাহিত্যের পুরষ্কার দেওয়া শুরু করেন। প্রথম বছরেই পুরষ্কার পায় সুকুমার রায়ের ‘পাগলা দাশু’ বইটি। সুকুমারের ‘পাগলা দাশু’র সঙ্গে দিদি সুখলতা রাও-এর ‘গল্প আর গল্প’ বইটিও সে বছর শিশু সাহিত্যের সেরা পুরষ্কার পায়।

প্রথম পত্রিকা সম্পাদক

১৯০৫ সালে কলেজ জীবনের শেষদিকে সুকুমার রায় তৈরী করেন ননসেন্স ক্লাব। বাড়ির লোকজন ছাড়াও তাঁর কলেজের বন্ধু বান্ধবরা ছিলেন সেই ক্লাবের সদস্য। এই ক্লাব থেকে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশও শুরু করেন সুকুমার। পত্রিকার নাম ছিল ‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা’। সুকুমারই ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক।

পত্রিকার এই অদ্ভুত নামকরণের রহস্য জানা যায় পুণ্যলতা চক্রবর্তীর ‘ছেলেবেলার দিনগুলি’ থেকে। তিনি লিখেছেন এখনকার চানাচুরওয়ালাদের মত সে সময় রাস্তায় ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত ‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা’। বত্রিশ রকম ভাজাভুজি এবং মশলা দিয়ে তৈরী সেই মুখরোচক খাবারের ঠোঙার ওপর একটা আধখানা ভাজা লঙ্কা দেওয়া হ’ত বলে তার নাম ‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা’। সেই অতি জনপ্রিয় মশলাদার মুখরোচক খাবারের নামেই সুকুমার তাঁর ক্লাবের পত্রিকার নাম রাখেন। নামের মতোই মজাদার ছিল সেই পত্রিকা।

উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর ১৩২০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস থেকে সুকুমার ‘সন্দেশ’ পত্রিকার সম্পাদনায় হাত দেন। কিন্তু ‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা’ ছিল তাঁর সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা। এই পত্রিকায় ‘পঞ্চ তিক্ত পাঁচন’ নামে পাঁচমিশেলি আলোচনার সম্পাদকীয় লিখতেন। এই ‘পঞ্চ তিক্ত’ কিন্তু মোটেই তেতো ছিল না, বরং সবথেকে মখরোচক ছিল এই অংশটি। এছাড়াও পত্রিকার জন্য কবিতা ও নাটক লিখেছিলেন।

প্রথম ছবি

১৩২০ বঙ্গাব্দে ‘সন্দেশ’ পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘ভবম হাজাম’ গল্পের সঙ্গে সুকুমারের আঁকা ছবি ছাপা হয়। এটিই সুকুমারের আঁকা প্রথম ছবি যেটি পত্রিকায় ছাপা হয়। লন্ডনে থাকার সময় তিনি ‘ভবম হাজাম’ গল্পের সঙ্গে ছাপার জন্য দু’টি ছবি এঁকে পাঠান। ১৯১৩ সালের ৬ জুন তারিখে লেখা একটি চিঠিতে সুকুমার এই ছবি আঁকার ও তা পাঠানোর কথা লিখেছেন। এর আগে ননসেন্স ক্লাবের হাতে লেখা পত্রিকার যাবতীয় অঙ্গসজ্জা তিনি নিজে হাতে করতেন। সেই পত্রিকায় তাঁর আঁকা অনেক ছবি ছিল এমন উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে পুণ্যলতা চক্রবর্তীর ‘ছেলেবেলার দিনগুলি’ বইতে।

নিজের লেখার সঙ্গে প্রথম ছবি ছাপা হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দে ‘সন্দেশ’ পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় তাঁর লেখা ‘আবোল তাবোল’ ধারার প্রথম কবিতা ‘খিচুড়ি’র সঙ্গে। এখানে ছবি শুধু অলঙ্করণ নয়, লেখার সঙ্গেই জড়িয়ে গেছে। ছবি বাদে লেখাটা অসম্পূর্ণ মনে হয়। কবিতার বকচ্ছপ, হাঁসজারু, গিরগিটিয়া, হাতিমি নামের আজব জন্তুগুলোকে সাহিত্য ও ছবির জগতে সুকুমারই প্রথম পরিচয় করালেন।

ছবি আঁকায় ছিল সুকুমারের সহজাত প্রতিভা। তিনি ছবি তোলাতেও অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। ১৯০৬ সাল নাগাদ সুকুমার রবীন্দ্রনাথের একটি দৃপ্তভঙ্গির ছবি তোলেন। এটিই সুকুমারের তোলা রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছবি যেটি পত্রিকার পাতায় ছাপা হয়। ছবিটি ‘মডার্ণ রিভিউ’ এবং ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। আলোক ঔজ্জ্বল্যের তারতম্যে সুকুমার ছবিতে রবীন্দ্রনাথের এক স্নিগ্ধ প্রশান্ত রূপ ধরেছিলেন।

মুদ্রক, প্রকাশক, স্বত্বাধীকারী শিবনাথ চক্রবর্ত্তী কতৃক অমরাগড়ী, হাওড়া থেকে প্রকাশিত এবং নিউ বাণী প্রেস কোম্পানী, অমরাগড়ী, হাওড়া ৭১১৪০১ থেকে মুদ্রিত।
email : jelarkhabar@rediff.co.in যোগাযোগ ঃ গ্রাম ও পোষ্ট — অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া। **সম্পাদক শিবনাথ চক্রবর্ত্তী। ফোন নং ঃ ৯৮০০২৮৬১৪৮**
Owned by Shibnath Chakraborty and Printed at New Bani Press Co.Amoragori, Jaypur, Howrah and published at Amoragori,Jaypur,Howrah.
Editor - Shibnath Chakraborty. Phone No. 9800286148